OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 509 - 517
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরাণ প্রয়োগে মনোজ মিত্র : ‘অশ্বত্থামা’ ও ‘তক্ষক’

রঞ্জিত আদক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার ও গবেষক
বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)
Email ID : ranjitadak.1990@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Myth, Puran, Ashwathama, Takshak, Salyaparva, Sauptikaparva, Mahabharata, Naxalite Movement, Kripacharya, Kritavarma.

Abstract

The term ‘Puran’ is commonly understood in Bengali as synonymous with ‘Myth’. While traditional Puranic texts narrate cosmic events and divine conflicts, noted Bengali playwright Manoj Mitra reinterprets these narratives to reflect contemporary socio-political realities. His plays Ashwathama and Takshak exemplify this approach, offering modern perspectives on ancient myths.

Ashwathama, inspired by the Salyaparva and Sauptikaparva of the Mahabharata, parallels the socio-political unrest of the Naxalite movement in Bengal. The play explores the internal turmoil of Ashwathama, whose impulsive violence, manipulated by Duryodhana, mirrors the frustration of Naxalite youth misled by political leaders. His misplaced rage, culminating in the tragic killing of the Pandavas’ sons, reflects the unintended consequences of revolutionary fervour. The characters of Kripacharya and Kritavarma further symbolize contrasting governance ideologies, subtly critiquing state suppression of dissent. Takshak, drawn from the Adiparva of the Mahabharata, delves into the inevitability of death through the story of King Parikshit, who is cursed to die within seven days from a serpent’s bite. Mitra transforms this myth into a meditation on human mortality, as Parikshit, gripped by fear, is guided by his charioteer, Tantripal, to embrace life despite its transience. The play’s philosophical depth reinforces the idea that true fulfilment lies in living wholeheartedly, even in the face of death.

Through these reinterpretations, Mitra skillfully bridges mythology with modern concerns, transforming ancient narratives into powerful reflections on contemporary socio-political struggles and timeless existential questions. Mitra conveys a universal truth- that death is inevitable, but life must be cherished. His use of Puranic narratives thus serves not just as historical storytelling but as a profound exploration of contemporary socio-political issues and eternal human anxieties. His plays not only challenge conventional Puranic interpretations but also offer profound insights into human emotions,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

governance, and mortality. In this research article, I will attempt to show how he has used mythology in the context of the present era.

Discussion

রবীন্দ্র পরবর্তীকালে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়কে হাসির আড়ালে রেখে নাটক লিখেছেন মনোজ মিত্র। তাঁর নাট্য তালিকা দীর্ঘ। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর ৬ খণ্ডের নাটক সমগ্র। প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ৭০। যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক— ৩৫টি, একাঙ্ক নাটক— ৩৩টি, ছোটদের নাটক— ২টি। এতগুলি নাটকের মধ্যে সরাসরি পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে ১২টি নাটকে। নাটকগুলি হল— 'পুঁটিরামায়ণ' (প্রথম খণ্ড), 'অশ্বত্থামা', 'রাজদর্শন', 'শিবের অসাধ্যি', 'চোখে আঙুল দাদা' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'নরক গুলজার', 'তক্ষক' (তৃতীয় খণ্ড), 'যা নেই ভারতে', 'জয়বাবা হনুনাথ', 'সত্যিভূতের গপ্পো' (পঞ্চম খণ্ড), 'ভেলায় ভাসে সীতা', 'আশ্চৌর্য ফান্টুসি' (ষষ্ঠ খণ্ড)। এই নাটকগুলির বিষয় যেমন বৈচিত্র্যে ভরা তেমনি কাহিনি বিন্যাস, সংলাপ রচনা, চরিত্র রূপায়ণ ও গানের সংযোজন নাট্যকারের মৌলিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেয়।

এই ১২টি নাটকের মধ্যে আমি আমার আলোচনায় শুধুমাত্র 'অশ্বত্থামা' ও 'তক্ষক' নাটকে পুরাণ প্রয়োগের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই দুটি নাটকে পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যবহার করলেও, পুরাণকে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়— 'পুনর্জন্ম' দিয়েছেন। আসলে নাট্যকার বলেছেন তাঁর যুগের মানুষের কথা। অর্থনৈতিক, সামাজিক অসহায়তার কথা, রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা। তাঁকে ঘিরে থাকা এই সমাজের বিচিত্র মানুষ, তাদের সরলতা তাদের কপটতার ভাষাই নাটকগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। যে প্রসঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন পুরাণকে। তবে কোনো বিদেশি পুরাণ নয় নিজের ভারতে প্রচলিত সবথেকে জনপ্রিয় দুই পুরাণ— রামায়ণ ও মহাভারতকে। এ দুই পুরাণ গ্রহণে নাট্যকার সক্ষম। কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে পরিচিত। তাই সেই পৌরাণিক যুগকে একালের যুগপোযোগী ভাবতে মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না।

তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারত, ভারতবর্ষের প্রাচীন দুই মহাকাব্য। পুরাণ এই দুই মহাকাব্যের অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভক্তরা তাদের আরাধ্য দেবতাকে ঘিরে গড়ে তুলেছেন পুরাণ কাহিনি। এই যে আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ— এসবেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথার বর্ণনা আছে। কিন্তু আদি দুই মহাকাব্যে আছে জীবনের স্পর্শ। কোনো ধর্ম কথা নেই তাই মানুষের প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে তা আকর্ষণ করে। আর পুরাণকে নিয়ে এই যুগে যেসব সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা রামায়ণ-মহাভারত কেন্দ্রিক। বলা যেতে পারে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির নবনির্মাণ চলছে। হ্যাঁ, যুগের তাগিদেই এমন নবনির্মাণ, এমন সৃষ্টি। মনোজ মিত্রও সেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটকে। পুরাণকে নতুনভাবে তিনরকম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে—

এক. পুরাণের ঘটনাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেওয়া।

দুই. পুরাণ কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনও কোনও ঘটনাকে নতুন ভাবে উদ্ভাবন করা যা পুরাণে বলা হয়নি।

তিন. পুরাণকে সমকালের করে পুনর্বিচার করা।

মনোজ মিত্র বিশেষত শেষ দুই প্রকারকে এই দুটি নাটকে প্রয়োগ করেছেন। এখানেই নাটকগুলির শিল্পগত গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

'অশ্বত্থামা' নাটকটির রচনা— ১৯৬৩। পুনর্লিখন ১৯৭২-'৭৩। প্রথম প্রকাশ— 'বহুরূপী' শারদ সংখ্যা ১৯৭৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— 'অশ্বত্থামা' ও তিন একাঙ্ক' নামে ১৯৮৬ খ্রিঃ। প্রথম অভিনয়— রঙ্গনা, ২ মে ১৯৭৪। উৎসর্গ— প্রয়াত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়কে। নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে যদিও একাঙ্ক নাটকের নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় নাটকটিতে। নাটকের কাহিনি এবং চরিত্র সম্পূর্ণ মহাভারতের। নাটকটির কোনো অঙ্কভাগ বা দৃশ্যভাগ নেই। সম্পূর্ণ নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত— গোধূলি পর্ব ও নিশীথ পর্ব। চরিত্র মাত্র তিনটি— অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং কৃতবর্মা। নাটকটি থিয়েটার ওয়ার্কশপ এর প্রযোজনায় যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন কৃতবর্মা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। বীর অশ্বত্থামার এক রক্তক্ষয়ী হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে নাটকটির মধ্যে। ড. জগন্নাথ ঘোষের মন্তব্য—

> "এই নাটক এক নতুন মহাভারত রচনার করুণ মধুর প্রয়াস।"[১]

নাটকটি সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারের বক্তব্য—

> "রানিগঞ্জে বসে ১৯৬২ সালে 'অশ্বত্থামা' নাটকটা লিখেছিলাম। বাংলার অধ্যাপক ড. রামদুলাল বসু, ইতিহাসের ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা দু'জন মিলে নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিলাম সেবার কলেজের সামনের মাঠে। ...নাটকটা বর্তমান চেহারায় আসে গত শতকের ১৯৭২-'৭৩ নাগাদ। অতীত ভুলে গিয়ে আবার লিখি 'অশ্বত্থামা'। বিভাস চক্রবর্তী তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপে। একদিন সারারাত্রি লিখে নাটক শেষ করে ভোরবেলা ছুটলাম দমদম নাগেরবাজারে। শুনল অশ্বত্থামা। পছন্দের নাটক পেয়ে বিভাস অশোক রই রই করে কাজ শুরু করে দেয় দেখেছি— এবারেও তাই হল। তাপস সেন বলেছিলেন, 'কোন আলোয় সমন্তপঞ্চকের হ্রদের পাশে দুর্যোধনের ভাঙা রথখানা দেখাব, সেটাই আমার চ্যালেঞ্জ!' এক একটা নাটক ওই শিল্পীর চোখে ছিল স্বপ্নের মতো। ডাকা হল পুতুল সাম্রাজ্যের সম্রাট রঘুনাথ গোস্বামীকে। দৃশ্যপট, সাজপোশাক, অলংকার থেকে পাদুকা সবকিছুর দায়িত্ব পেয়ে এক দুপুরে চিৎপুরের ট্রামলাইন ধরে লালবাজার পর্যন্ত দু'পাশের মনোহারী মণিহারী দোকানগুলো ঢুঁড়ে বের করা হল যতরকমের শাঁখ, কড়িমালা, মোষের শিং, হরিণের চামড়া, ফকিরবোষ্টমের মালা বালা— কত কী! থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু'র হইচইয়ের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল নাটকটা। সুদীপ্ত বসু (অশ্বত্থামা), অশোক মুখোপাধ্যায় (কৃপাচার্য) ভাল অভিনয় করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি কৃতবর্মা হয়েছিলাম আমি। একমাসের মধ্যে দূরদর্শনে চাকরি নিয়ে বিভাস ছুটল পুণায়। বন্ধ হল 'অশ্বত্থামা'।[২]

নাট্য ঘটনার কাহিনি মহাভারতের শল্যপর্ব ও সৌপ্তিক পর্ব থেকে গ্রহণ করেছেন মনোজ মিত্র।

এই দুই পর্বের কাহিনিটি আগে জেনে নিই। শল্য পর্বের একেবারে শেষে অশ্বত্থামার অভিষেক হয়েছে সেনাপতি পদে। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিন যুদ্ধের শেষ দিনে ভীমের গদাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়েছে। কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দূতমুখে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ শুনে ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তার জন্য আমার তত শোক হয়নি, যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাঞ্চলদের যমালয়ে পাঠাব। তুমি আমাকে অনুমতি দাও। দুর্যোধন খুশি হয়ে অশ্বত্থামাকে আলিঙ্গন করলেন এবং সেনাপতির পদে তাকে অভিষিক্ত করলেন। তারপর কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বত্থামা সেখানে থেকে চলে গেলেন আর দুর্যোধন পড়ে রইলেন স্ব-স্থানে।

সৌপ্তিক পর্বের প্রথমে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা সেখান থেকে কিছুদূর এসে এক ঘর বনে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বটবৃক্ষে সুপ্ত কাকের প্রতি পেঁচার আক্রমণ দেখে স্থির করলেন তিনিও সেই রাত্রিতেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করবেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা লজ্জিত বোধ করলেন। তাদের অনুমতি ছিল না এই কাজে, কিন্তু বাধ্য হয়। অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডব শিবিরের অভিমুখে রওনা হচ্ছে তখন তারাও নিজে নিজে রথে চড়ে অনুগমন করলেন। শিবিরের দ্বারদেশে থাকলেন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা; আর শিবিরের প্রবেশ করলেন অশ্বত্থামা। প্রবেশ করে একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রদের, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল, হস্তী, অশ্ব সবকে বধ করলেন। যারা পালাতে চাইল তারা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের দ্বারা নিহত হলেন। অর্থাৎ বেঁচে রইলেন কেবল পাণ্ডবদের সাতজন— পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি আর কৌরবদের তিন জন— কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা। হত্যাকাণ্ডের শেষে অশ্বত্থামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয় সংবাদ দেব। এই পর্যন্ত কাহিনি নাট্য কাহিনির খাতিরে আলোচনা করা হল, বাকি অংশ অপ্রাসঙ্গিক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনোজ মিত্র নাটকের গোধূলি পর্বের শুরুতে যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিনজন নয় কেবল ভোজরাজ কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য বসে আছেন দুর্যোধনের ভাঙ্গা রথের কাছে। কৃতবর্মা জানাচ্ছেন— ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসে ভারতবর্ষ শাসন করবেন। কৃপাচার্য পরাজয় মেনে নিয়েছেন কিন্তু কৃতবর্মার আশা তিনি অশ্বত্থামাকে সঙ্গে নিয়ে আবার যুদ্ধে নামবেন—

> "...অনন্ত সংগ্রাম! মহারাজ আমৃত্যু সংগ্রামী নেমেছেন! যতক্ষণ এতটুকু শ্বাস... ততক্ষণ প্রয়াস! জয় চাই... চাই বিজয়মাল্য!"[৩]

মহাভারতের কৃতবর্মা এরকম কথা বলেননি, বরং সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন। নাটকে কৃতবর্মাই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করতে চেয়েছেন। বলেছেন তিনি—

> "কাল প্রাতে অশ্বত্থামা, তুমি হবে কৌরব সেনাপতি! পঞ্চম কৌরব সেনাপতি! ভীষ্ম দ্রোন কর্ণ শল্য... অশ্বত্থামা! বীর অশ্বত্থামা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য! পঞ্চপাণ্ডবের বিজয়হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা... চাই পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন শির।"[৪]

মহাভারতে এই প্রসঙ্গ অশ্বত্থামার। সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন মনোজ মিত্র। মহাভারতে এই প্রসঙ্গে অমত হয়েছিলেন স্বয়ং কৃতবর্মা। আর এখানে অশ্বত্থামা নিজে। অশ্বত্থামা জানিয়েছেন— 'আমায় ক্ষমা করো দুর্যোধন...।' কিন্তু কৃতবর্মা শেষপর্যন্ত পেরেছে আগুনে ঘি সংযোজন করতে। কৃপাচার্যের কথা মত অশ্বত্থামা রাজি হয়েছিল অস্ত্র পরিত্যাগ করে সন্ধি স্থাপন করতে, পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা চাইতে। চেয়েছিল সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে। যেখানে কোন ভোগ তৃষ্ণা থাকবে না। কিন্তু কৃতবর্মা তা হতে দেয়নি। উত্তেজিত করেছে অশ্বত্থামাকে পাণ্ডব শিবিরে শোকরজনীতে পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যা করতে। মহাভারতের কৃতবর্মা ছিল সহৃদয় মানুষ। এখানে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন নির্দয় রূপে। অশ্বত্থামাকে ইন্ধন দিয়েছেন—

> "ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, পাণ্ডব পাঁচজন একঘরে! ওরা ছাড়া আর কেউ নেই! ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, নির্ভুল লক্ষ্যভেদের সুযোগ..."[৫]

নিরস্ত্র, ধ্যানমগ্ন পাণ্ডবদের কথা শুনে রাজি হয়েছে অশ্বত্থামা। জীবনের শেষ যুদ্ধের জন্য। অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কাছে গেলে কৃতকর্মা বলে—

> "ওঃ! ওঃ! অপূর্ব দৃশ্য! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা শায়িত মহারাজের কণ্ঠলগ্ন।"[৬]

কুটনৈতিক চাল চেলেছে কৃতবর্মা। তাইতো অশ্বত্থামা একসময় কৃপাচার্য, যে তার মাতুল তাকেও বধ করতে উদ্যত হয় সে। আবার কৃপাচার্যের সাহায্য ছাড়া পাণ্ডবের শিবিরে প্রবেশ করা যাবে না একথা জানে কৃতকর্মা। তাই কৃপাচার্যকে উৎসাহিত করে সে -

> "দেখবে, দেখবে, এখুনি সর্বাগ্রে ওঁর ঘোড়াটাই ছুটবে আমাদের আগে আগে! (কৃপকে) আসুন আচার্য, মঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন!"[৭]

নিশীথ পর্বে কৃতবর্মাই দুর্যোধনের রথের সামনে ছুটে এসে পাণ্ডবদের নিহত হওয়ার খবর দেয়। আনন্দে মেতে ওঠে। যদিও হত্যা হয়নি পাণ্ডবদের। কৃতবর্মা চরিত্রটি নিয়ে মহাভারত-এর মতো করে একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, তাঁর 'মহাভারতের প্রতিনায়ক' গ্রন্থে।

অশ্বত্থামা চরিত্রটি মহাভারত থেকে নিলেও তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন নাট্যকার। দুর্যোধনের করুন অবস্থা দেখে দুঃখ করছে, অনুশোচনা করছে। দুর্যোধনের সেনাপতির পদ সে গ্রহণ করতে পারবে না। কেন না এতদিন যখন সময় ছিল সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধে জয়লাভ করার, তখন সে পায়নি। আর আজ এই সূর্যাস্তের সময় যখন সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে তখন তাকে বরণ করতে হবে সেনাপতির পদ— এটা সে মানতে পারেনি। তাছাড়া তার শত্রু মাত্র পাঁচজন কিন্তু সে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেছে হাজার হাজার সৈন্য। তার বিবেক তাকে দংশন করে। সারা জীবন কাদের মারতে কাকে মেরেছে সে। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে অশ্বত্থামা—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মহারাজ, আঠারো দিনের আঠারো হাজার মানুষ মেরেছি। তারা কেঁদেছে-ছুটেছে-বাঁচাও বাঁচাও-বাঁচতে দিইনি! অথচ যাদের মরার কথা- সেই পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু বেঁচে আছে! তারা জয়ী!... দুর্যোধন ক্ষমা করো।"[৮]

এই অনুশোচনা মহাভারতে নেই বরং সেখানে আছে তার প্রতিশোধ স্পৃহা। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এই বিষয়টি দেখিয়েছেন তাঁর 'মহাভারতের প্রতিনায়ক' গ্রন্থে। এই যে চরিত্রের নবরূপায়ণ— এখানে মনোজ মিত্রের বিশেষত্ব। তাই অশ্বত্থামা চায় স্বাধীন জীবন, মামা কৃপাচার্যকে নিয়ে গড়তে চায় সুখের নীড়। এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে বাস করবে সে। সমস্ত সুখকে, ভোগকে জীবন থেকে সরিয়ে মামার পায়ের কাছে বসে শুনতে চায় সে ভূলোক দ্যুলোক গোলোকের কথা। জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তে সে শেষপর্যন্ত অটল থাকতে পারেনি। কৃতবর্মা তাকে শেষপর্যন্ত নিয়ে গেছে পাণ্ডব শিবিরে। শত্রু চিনিয়েছে আবার নতুন করে। শোকরজনীতে যখন সবাই ত্যাগ করেছে অস্ত্র তখনই অশ্বত্থামার হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র। রাত্রির অন্ধকারে চিনতে ভুল করে জীবনের সবথেকে বড় ভুল করে ফেলেছে অশ্বত্থামা। পঞ্চপাণ্ডবের পরিবর্তে সে হত্যা করেছে পঞ্চপাণ্ডব শিশু। হাহাকার করেছে নিজের কৃতকর্মের জন্য—

> "ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি... কাদের মারতে কাদের মেরেছি! অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ!"[৯]

কৃপাচার্যকে নাট্যকার এখানে অশ্বত্থামার অভিভাবক রূপে যেন অঙ্কন করেছেন। একথা নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও বলেছেন 'মহাভারতের ছয়প্রবীণ' গ্রন্থে। সে এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তে আসেনি দুর্যোধনের জন্য! এসেছে ভাগ্নে অশ্বত্থামার জন্য। অশ্বত্থামাকে নিয়ে সে যেতে চায় পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা স্বীকার করতে। বাঁচতে চায় নতুন করে। কিন্তু পরিস্থিতি বাধ সাধে। অশ্বত্থামাকে বোঝাতে চায় যে পাণ্ডবেরা আমাদের শত্রু নয়। আমাদের ভুল শত্রু চিনিয়েছে দুর্যোধন। রাজা দুর্যোধন এমনি আশ্রয় দেয়নি আমাদের। বিপরীতে সে তৈরি করেছে বাহুবল। রাজা কোনো অভিসন্ধি ছাড়া কাউকে সাহায্য করে না। কৌরবদের মতো নয় পাণ্ডবেরা। যুদ্ধ জয়ের আনন্দোৎসব তারা করবে না। কেননা তারা জানে কত প্রাণের বিনিময়ে তাদের এই জয়! তাই পাণ্ডব শিবিরে আজ শোকরজনী! —

> "ওরা নিষ্ঠুর নয়! ওরা জানে কতো অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই জয়লাভ! আনন্দ করার মতো নির্বোধ ওরা নয়! ওদের শিবিরে আজ শোকের রজনী!"[১০]

আরও বলে— আমরা হলে জয়োৎসব করতাম। পাণ্ডব জানে এটা তাদের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল। দুর্যোধনের হাতে নির্যাতনের দিনগুলিকে তারা স্মরণ করে আজ নিভৃতে অশ্রুপাত করবে। ওরা জানে প্রাণের মূল্য! তাই আমরাও আজ চলো শোকরজনী পালন করি। নরহত্যার অভিশাপ থেকে মুক্ত হই। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমা করবে। মহাভারতে ব্যাসদেব, কৃপাচার্যকে এত মানবিক করে আঁকেননি। যা নাট্যকার দেখিয়েছেন। প্রার্থনা করেছে কৃপাচার্য পাণ্ডবেরা যাতে নতুন ভারত গড়তে পারে। যেখানে হত্যা থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না, পাপ থাকবে না। কিন্তু নাটকের নিশীথ পর্বে ঘটনার পরিবর্তন ঘটে। অশ্বত্থামাকে ফেরাতে পারেনি হিংসা থেকে। পঞ্চপাণ্ডবের শিবিরে বাধ্য হয়েছে অশ্বত্থামা কৃতকর্মার সঙ্গে যেতে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল আলাদা—

> "ভেবেছিলাম ঐ ঘাতক শিবিরের ঢুকলে আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করব... ভীষণ আর্তনাদ... পাণ্ডবদের সতর্ক করে দেব!"[১১]

পাণ্ডবদের জীবন রক্ষা করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত একটা চিৎকারও করতে পারেনি। তাই পঞ্চ পাণ্ডবদের পরিবর্তে পঞ্চপাণ্ডব শিশু হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামাকে বলেছে—

> "পিশাচ! পিশাচ! জগতের নিকৃষ্টতম হত্যাকারী!"[১২]

ক্রুদ্ধ হয়ে হত্যা করতে গিয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় অশ্বত্থামাকে—

> "পৃথিবী তুমি মুখ লুকাও, আজ আমি এই নরঘাতী যৌবন ধ্বংস করব!"[১৩]

রক্ত মাংসের চরিত্র যেন এই কৃপাচার্য। কোনো পৌরাণিক চরিত্র নয়! জীবন্ত প্রাণবন্ত এক মানুষ। যার আছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধহীন এই সমাজে বার্তা পাঠাতে মনোজ মিত্র হয়তো এরকম চরিত্র গঠন করেছেন— নতুন ভঙ্গিতে, নতুন আমেজে! এখানেই নাট্যকারের মৌলিকতা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই নাটক পুনর্লিখিত হয়েছিল ১৯৭২–'৭৩ এ। অর্থাৎ দেশে যখন নকশাল আন্দোলনের হত্যা ও প্রতিহত্যা চলছে। শাসকদের সঙ্গে বিপ্লবী তরুণদের দ্বন্দ্ব। তবে শুধু তাই নয়, যারা বিপ্লবী নেতা তারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তরুণদের বিভ্রান্ত করেছে, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নাটকের সেই তরুণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধন বিপ্লবী নেতা। সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইসব তরুণদের বিভ্রান্ত করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক আধিপত্য সহজেই দেখতে পাই। যুবক অশ্বত্থামা যে যুদ্ধে সেনাপতিত্ব বরণ করছে, সেই যুদ্ধ, তার কোনো উপকারে আসবে না। দ্রোন তার পিতা— যে আশ্রয় পেয়েছিল, সম্মান পেয়েছিল কৌরবদের কাছে। সেই আনুগত্য থেকে গেছে অশ্বত্থামার মধ্যে। অকৃতজ্ঞ নয় সে। তাই হয়তো এই যুদ্ধে নিজেকে সমর্পণ করেছে। যুগ যুগ ধরে, বংশ-পরম্পরায় এমন আনুগত্য প্রকাশ সহজেই দেখা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এটাই নীতি যে, বাবা যেদিকে থাকবে ছেলেও সেদিকে। অশ্বত্থামা সেই কর্তব্য সেই আনুগত্যের শিকার। রাজনীতির খেলায় যেমনটা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে— তরুণ প্রজন্মকে, শাসক দলের ব্যবহার— তেমনটাই এ নাটকে দেখি।

নাট্যকারের অন্য দুটি চরিত্র— কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের মধ্য দিয়ে শাসনতন্ত্রের দুটি বিপরীত ভাবধারাকে তুলে ধরা হয়েছে। কৃপাচার্যের যুদ্ধ শেষে শান্তি কামনা করতে চেয়েছে। পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনায় ও সন্ধিতে রাজী। কিন্তু কৃতকর্মা তা নয়। অশ্বত্থামাকে যুদ্ধমুখী করেছে সে। একজন রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর মতো তার ব্যবহার, কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চাইলে কৃতবর্মা তাকে উত্তেজিত করেছে, তার প্রতিশোধ স্পৃহাকে বাড়িয়ে তুলেছে। একই রাজনৈতিক মতাদর্শে যেমন দু'প্রকৃতির মানুষ থাকে তেমনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। একজন নরমপন্থী আর একজন চরমপন্থী।

পুরাণকে নতুন করে সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক পুরাণ কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তাঁর নিজের কালের নৈতিকতাকে, ঘটনাকে রূপকের আড়ালে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন এদিক থেকেই অশ্বত্থামার সৃষ্টি।

'তক্ষক' নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশও ঐ বছর। পুনর্লিখন— ১৯৮১। প্রথম অভিনয়— ১৯৭৯, ২৫ জুন। প্রযোজনা— থিয়েটার ওয়ার্কশপ। নাটকের শুরুতেই ঘোষকের কণ্ঠে শোনা যায়— পুরাকালের কথা। এখানে প্রধান যে তিনটি পৌরাণিক চরিত্র তা হল— রাজা পরীক্ষিত, ঋষি শমীক এবং ঋষিপুত্র শৃঙ্গী। তক্ষকও পৌরাণিক। তক্ষক সম্পর্কে পৌরাণিক অভিধানে বলা আছে— প্রধান অষ্টনাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। পুরাণ মতে অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক— এই তিনজন প্রধান। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা এবং অনন্তনাগ নামেও প্রসিদ্ধ।

তক্ষককে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কাহিনিটি এরূপ— অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত মৌনী তপোরত মহর্ষি শমীকের কাঁধে মৃত সাপ নিক্ষেপ করলে, শমীকের পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত হন যে, সপ্তরাত্রির মধ্যে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। শমীক পরীক্ষিতকে অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত করে সতর্ক করে দেন। পরীক্ষিত এক সুরক্ষিত প্রাসাদে বিষ-চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাবধানে বসবাস করতে থাকেন। সাতদিনের দিন কাশ্যপ নামে এক দক্ষ বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের কাছে গমনরত ছিলেন। তক্ষকও ঐদিনে অভিশাপের বিবরণ জ্ঞাত হয়ে অর্জুনের বংশধরকে দংশনেচ্ছায় যাত্রা করেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, তক্ষকের কাছে অর্জুন শত্রুপদবাচ্য। কেননা খাণ্ডবদাহনকালে অর্জুনের শরে তক্ষকের স্ত্রী-পুত্র বিদ্ধ হন। তাই অর্জুন এবং তাঁর বংশধরেরা তক্ষকের শত্রু। সে যাইহোক, ঐ কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ এবং তক্ষকের পথে সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাঁর শক্তি পরীক্ষার্থে তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে ভস্মীভূত করলে, কাশ্যপ মন্ত্র বলে তাকে পুনরায় জীবিত করেন। এতৎদৃষ্টে তক্ষক কাশ্যপকে বলেন যে, রাজার আয়ু ক্ষয় হয়ে এসেছে। অতএব তাঁকে এখন চিকিৎসা করা বৃথা। সুতরাং কাশ্যপ যেন আশাতিরিক্ত ধন তক্ষকের কাছ হতে গ্রহণ করে বিদায় হন। কাশ্যপ ধ্যান বলে তক্ষকের কথা সত্য বলে জ্ঞাত হয়ে তাঁর কাছ হতে অভীষ্ট ধন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্মণবেশী নাগের সাহায্যে রাজার কাছে কিছু ফলমূলাদি প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত ফল গ্রহণ করে খাওয়ার উপক্রম করলে ফল মধ্যে তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ কীট দর্শনে বলেন যে তাঁর আর কোন ভয় বা দুঃখ নেই— শৃঙ্গীর বাক্যই সত্য হোক। এই কীট তক্ষক রূপ ধারণপূর্বক তাঁকে দংশন করুক। এই উক্তি করে তিনি সহাস্যে কণ্ঠদেশে সেই কীটটি স্থাপন করেন। তখন তক্ষক নিজ মূর্তি ধারণ করে পরীক্ষিতকে দংশন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তার পুত্র জনমেজয় রাজা হন। এই কাহিনি মহাভারতের। মনোজ মিত্র এই কাহিনি গ্রহণ করলেও ঘটনার পরিবর্তন করেছেন। কাহিনিকেই তিনি এখানে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

তক্ষক এর কাহিনিটি এরূপ— পরীক্ষিত মৃগয়াকালে এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে জঙ্গলে পথ হারান। সেই লতা-গুল্ম ভরা জঙ্গলে শমীক নামক এক ঋষি গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন। ঋষিকে দেখতে পেয়ে রাজা পরীক্ষিত নানাভাবে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়। তখন রাজা বিরক্ত হয়ে মৃত সাপকে তাঁর ধনুকের মাথায় জড়িয়ে ঋষি শমীকের গলায় পরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরও ঋষি মৌন থাকেন। কিন্তু পিতার অবমাননা দেখে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেন— সাত দিনের মাথায় তক্ষকের কামড়ে সে প্রাণ হারাবে। রাজা চলে যাওয়ার পর ঋষি শমীকের ধ্যান ভাঙ্গে। সে পুত্রকে তিরস্কার করে। জীবনধারণের জন্য রাজা যা করেছে তাই স্বাভাবিক কিন্তু শৃঙ্গী যা করল তা অপরাধ। কেননা তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দান না করে তাকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছে। পুত্রকে ঋষি শিখিয়েছে— পুণ্যার্জনই সব নয়, পুণ্য রক্ষা করতে হয়। এরপর ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয়। সে রাজাকে যেতে বারণ করে দূর থেকে তাকে আহ্বান করছে সে যেন তার জলপাত্র ভরে নিয়ে যায়। এই অনুশোচনা পুরাণ বহির্ভূত। শৃঙ্গী অনেকটাই মানবিকগুণ সম্পন্ন এখানে। শৃঙ্গী পিতাকে অনুরোধ করেছে রাজাকে রক্ষা করার জন্য। এ ঘটনাও মহাভারতে নেই। কিন্তু ব্রহ্মশাপ অনিবার্য। মৃত্যু হবেই রাজার। তবে পিপাসার্ত অবস্থায় যেন সে প্রাণত্যাগ না করে এই ইচ্ছা শৃঙ্গীর। পুত্রের কথামতো মায়া সরোবর, মায়া ঝর্ণা সৃষ্টি করল ঋষি। কিন্তু সবেই রাজা তক্ষককে দেখতে পেল। দেখতে পেল বিশাল ফনা ধারণ করে তক্ষক তাকে দংশন করতে ছুটছে। এরূপ মায়া সরোবর বা মায়াঝর্ণা সৃষ্টির কথা পুরাণ বহির্ভূত। শেষে শৃঙ্গী নিজেই পরীক্ষিতকে জানিয়েছে যে, সে ব্রহ্মশাপ তুলে নেবে। সেই অভিশাপ তার নিজের ওপর বর্তাবে। সাতদিনের মাথায় পরীক্ষিতের জায়গায় শৃঙ্গী নিজে মরবে। কিন্তু পরীক্ষিত জীবনের অর্থ বুঝেছে। মৃত্যু জীবনের-ই পরিণতি। সে তাই আর মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে সে জয় করেছে। সাতদিনের মাথায়ই তাঁর মৃত্যু হবে তবে মৃত্যুর পূর্বে যে ছ'দিন আছে সেই ছ' দিন সে বাঁচবে, বিরাট হয়ে বাঁচবে। পুরাণে কাহিনিটি ঠিক উল্টো। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে নতুন সুরক্ষিত প্রাসাদ তৈরি করেছে। নিজেকে বিষ চিকিৎসক দ্বারা আবৃত রেখেছে। পুরাণে রাজার অভিশাপের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করেছে ঋষি শমীক। তাকে বাঁচার পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার পিপাসা দূর করার জন্য কোনো মায়া সরোবর বা মায়া ঝর্ণার সৃষ্টি করেননি।

প্রধান পৌরাণিক চরিত্র তিনটি সম্পর্কে এবার একটু দৃষ্টি দিলে দেখব সম্পূর্ণ নয় কিছুটা পরিবর্তন করেছেন নাট্যকার। পুরাণে পরীক্ষিতের পরিচয়— চন্দ্রবংশীয় এক রাজা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও সুভদ্রার পৌত্র, অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র এবং জনমেনজয়ের পিতা। মৃগয়াকালে বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণে পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শমীক নামক এক মৌনব্রতী তপস্যারত মুনির দর্শন পেয়ে তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কোন উত্তর না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি একটি মৃত সাপকে ঋষির গলায় পরিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় পিতার অবমাননা সহ্য করতে না পেরে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেয় সাতদিনের মাথায় তক্ষকের কামড়ে মৃত্যু হবে রাজার। ধ্যান ভাঙ্গার পরে ঋষি শমীক রাজাকে সচেতন করে পুত্রের অভিশাপ বিষয়ে এবং রাজা তখন এক নতুন প্রাসাদ তৈরি করে সর্প চিকিৎসক আবৃত হয়ে থাকতে লাগলেন। কাশ্যপ নামক এক বিষ চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে, তক্ষক অর্থ দান করে পথ থেকে সরিয়ে দেন। এবং তক্ষকের নির্দেশে কিছু নাগ তপস্বী বেশে বহুপ্রকার ফল নিয়ে পরীক্ষিতকে ফল উপহার দিয়ে আসেন। সেই ফলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ এক কীটকে রাজা দেখতে পান। এবং সেই কীটকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন শৃঙ্গীর বাক্যকে সত্য করার জন্য আর তখনই তক্ষক নিজমূর্তি ধারণ করে পরীক্ষিতকে দংশন করে। এরূপ চরিত্র পুরাণের। নাটকে কিন্তু কোনো প্রাসাদ গড়ার বা কোনো সর্প চিকিৎসকের কথা বলা নেই যারা রাজাকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ রাজা এখানে নিজেকে রক্ষায় সচেষ্ট নয়। বরং সে মৃত্যুকে জয় করতে শিখেছে। স্বয়ং শৃঙ্গী তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মহান চরিত্র রূপে নাট্যকার চরিত্রটিকে এঁকেছেন।

ঋষি শমীক চরিত্রটি পুরাণের হুবহু অনুকরণ নয়। একটু পরিবর্তন আছে। পরিমার্জন করেছেন নাট্যকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে পরীক্ষিতের তৃষ্ণা দূর করার জন্য মায়া সরোবর বা মায়া ঝর্ণার সৃষ্টি করেছে। পুরাণে শমীক রাজাকে সচেতন করেছে তাঁর মৃত্যু বিষয়ে, এখানে সেরকম কোনো বিষয় নেই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সবথেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর। অনুশোচনার আগুনে নিজে ঝলসে মরেছে, বাঁচাতে চেয়েছে রাজা পরীক্ষিতকে। নিজের মৃত্যু কামনা করেছে শেষে। নিজের বিষে ছটফট করছে নিজে। এইরূপ পুরাণ বহির্ভূত। মহাভারতের শৃঙ্গীর তুলনায় অনেক মানবিক সে।

সমগ্র কাহিনিটি নাট্যকার ছ'টি দৃশ্যে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটির দৃশ্যপট সম্পর্কে নাট্যকারের নির্দেশ নাটকটিকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল দান করেছে। এই নাটকে জীবনের মূল্য সম্পর্কে নাট্যকার ইঙ্গিত করেছেন। মৃত্যু জীবনের পরিণতি। মাইকেলের কথায়— 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে, কোথা কবে।' (বঙ্গভূমির প্রতি) — কেউ কোনোদিন অমর নয়। তবে মৃত্যু ভয়ে থেকে, জীবনের স্বাদগ্রহণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়। জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যু একদিন নিশ্চিত। —এটি ধ্রুব সত্য। মানুষ বাঁচতে চায়, কিন্তু জীবন মাত্রেই মরণশীল। মৃত্যু হলেই পুনর্জন্ম। তাই মৃত্যু বীভৎস নয়, বরং তা মধুর। নাটকটির কাহিনি যে মহাভারত থেকে নেওয়া সেখানে এই সহজ সত্যটি বুঝতে পারেনি রাজা পরীক্ষিত। নাটকে সেই পরীক্ষিত বুঝতে সক্ষম হয়েছে। যে ক'দিন বাঁচবো জীবনে বাঁচার মতোই বাঁচবো। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে নাটকের পরীক্ষিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

এই নাটকে পাঁচটি চরিত্র। পরীক্ষিত, ঋষি শমীক, ঋষিপুত্র শৃঙ্গী, সারথি তন্ত্রিপাল এবং মহামন্ত্রী। পরীক্ষিত, শমীক, শৃঙ্গী মহাভারতের চরিত্র হলেও তন্ত্রিপাল এবং মহামন্ত্রী নয়। তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সারথি হয়ে সে জীবনের যা মানে বুঝেছে, একজন রাজা হয়েও পরীক্ষিত সেই অর্থ বুঝতে পারেনি। মৃত্যু ভয় তাকে গ্রাস করেছে। সারথি জীবনের মন্ত্র শিখিয়েছে রাজাকে। সাধারণ মানুষ জীবন যেভাবে অতিবাহিত করে, একজন বিত্তবান, ক্ষমতাবান মানুষ জীবনকে সেভাবে দেখতে পারে না। সাতদিনের মাথায় মৃত্যু হবে— এই ভবিষ্যৎ জানতে পেরে মৃত্যু ভয়ে কাতর রাজাকে উদ্দেশ্য করে তন্ত্রিপাল বলেছে— জীবনের এক একটা দিন এক একটা সমুদ্র। মৃত্যু সাত সমুদ্রের পরে। ততদিন ভালো করে বাঁচতে হবে—

> "বাঁচুন ...বাঁচুন ...মহারাজ সাতদিনের প্রতি মুহূর্তে বাঁচুন...।"[১৪]

অনেকসময় জীবনের দার্শনিক সত্য সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। তন্ত্রিপালের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাকেই দেখিয়েছেন। মন্ত্রীও, তন্ত্রিপালের মতো জীবনকে সহজ ভাবে অনুভব করেছে। রাজা পরীক্ষিত যখন তন্ত্রিপালের কথায় উজ্জীবিত হয়ে জীবনে যে ছ'দিন আছে তা উপভোগ করে বাঁচতে চেয়েছে তখন মন্ত্রী বলেছে—

> "ধন্য ধন্য রাজা! ধন্য পরীক্ষিত।"[১৫]

মনোজ মিত্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের তুলনায় তক্ষক তাই একটু ভিন্ন মাত্রার নাটক। নাটকের নাম দিয়েছেন তক্ষক। কিন্তু কোনো তক্ষক চরিত্র রাখেননি। তক্ষকের নাম নিয়েই নাটকের কাহিনি গভীরতা লাভ করেছে কিন্তু সরাসরি তক্ষকের কোনো সংলাপ নেই। তক্ষক আসলে এক প্রতীক মাত্র। মৃত্যু ভয়ের প্রতীক। সেই ভয়েই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে দেয়। জীবনের স্বাদ গ্রহণে অপূর্ণ থেকে যায়। পুঁটিরামায়ণ, অশ্বত্থামা, নরক গুলজার, যা নেই ভারতে প্রভৃতি নাটকেও পুরাণ আছে। তবে তা অন্য মাত্রায়— হয় রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটকগুলি রচিত হয়েছে কিন্তু তক্ষক, জীবনের অর্থ প্রকাশক নাটক। বলা যায় পৌরাণিক মোড়কে মোড়া গভীর জীবন দর্শনের নাটক এটি।

Reference:

১. ঘোষ, জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কল-০৯, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৫৭
২. মিত্র, মনোজ, মনোজাগতিক, 'অশ্বত্থামা ও সত্যসন্ধান', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০২২, পৃ. ৮৬-৮৭
৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (২), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ- ১৪২২, পৃ. ৫৫
৪. তদেব, পৃ. ৫৮
৫. তদেব, পৃ. ৬৮
৬. তদেব, পৃ. ৬৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 509 - 517
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৭১
৮. তদেব, পৃ. ৫৮
৯. তদেব, পৃ. ৭৯
১০. তদেব, পৃ. ৬৫
১১. তদেব, পৃ. ৭৫
১২. তদেব, পৃ. ৭৯
১৩. তদেব, পৃ. ৭৯
১৪. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (৩), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ- ১৪২২, পৃ. ৪৩৫
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩৮

Bibliography:

ঘোষ, জগন্নাথ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, কল-০৯, পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৫
চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম); ডি.এম. লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৩৭১
মিত্র, মনোজ; নাটক সমগ্র (২); মিত্র ও ঘোষ; কল-৭৩; পঞ্চম মুদ্রণ; ভাদ্র ১৪২২
মিত্র, মনোজ; নাটক সমগ্র (৩); মিত্র ও ঘোষ; কল-৭৩; পঞ্চম মুদ্রণ; ভাদ্র ১৪২২
মিত্র, মনোজ, মনোজাগতিক, 'অশ্বত্থামা ও সত্যসন্ধান', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০২২
সরকার, সুধীর চন্দ্র; পৌরাণিক অভিধান; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স; কলি-৭৩; একাদশ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী; মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া; পুস্তক বিপণি; কল-৯; দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫
Kosambi, D.D.; Myth and Reality; Published by Ramdas G. Bhatkal for popular prakashan; reprinted 1994